ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৪ ও ১০৫ (যুক্ত), সেপ্টেম্বর ২০২৪
ISSN: 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10405/016

প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগীয় বাংলার স্টাকো শিল্প

অর্ণব চ্যাটার্জী*

সারসংক্ষেপ: Like terracotta art, stone and bronze sculptures, stucco art has also occupied a significant place in Indian art since ancient times. Stucco art became popular in Bengal during the post-Gupta and early Medieval period, for decorating Buddhist *Vihāras* and Hindu temples, and this tradition continued over time. The study of Stucco art of Bengal has been overlooked in the discussion of art centres in the past few decades, so this article will mainly focus on the chronological history of stucco art of Bengal. Region-wise characteristics of this art will be discussed and analysed based on several primary and secondary sources and fieldwork-based data collections. The observation gives the impression that the various experiments by the artists of Bengal during the early Medieval period resulted in the development of a distinctive style of stucco art, which was different from the contemporary popular terracotta art. In some cases, stucco art was used instead of terracotta art, which is a classic example of the increasing demand for art. This article will provide a comprehensive discussion of stucco art in Bengal.

মুখ্যশব্দ: স্টাকো, কর্ণসুবর্ণ, চন্দ্রকেতুগড়, মহানাদ, মোগলমারী, পাহাড়পুর, ইটাখোলা মুড়া

* পিএইচডি গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

১. প্রাককথন

ভারতীয় উপমহাদেশে আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে থেকে ভাস্কর্য নির্মাণের সূত্রপাত ঘটেছিল। উপমহাদেশের প্রথম নগরাশ্রয়ী সভ্যতা বিকাশের সময়পর্ব থেকে স্থাপত্যের সাথে ভাস্কর্যের উপাদানগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই সময় থেকে শিল্পীরা (স্থপতি বা ভাস্কররা) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য তৈরির ক্ষেত্রে একই উপাদানের ব্যবহার করতে থাকে। এক্ষেত্রে ব্রোঞ্জ ছিল ব্যতিক্রম, কারণ ব্রোঞ্জ শুধুমাত্র ভাস্কর্য নির্মাণে ব্যবহৃত হত। কিন্তু মাটি ও স্টাকো ছিল এমন দুটি উপাদান যা উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। খ্রিষ্টপূর্ব দুই হাজার বছর আগে এই দুটি উপাদান স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় ছিল। মাটি যেমন স্থাপত্য গাত্রে প্লাস্টারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো, তেমনি এই মাটিকে নির্দিষ্ট আকার দিয়ে, তারপর সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে বিভিন্ন ভাস্কর্য নিদর্শন বানানো হতো। অন্যদিকে স্টাকো ছিল এমন একটি উপাদান যা এই কালপর্বে পয়ঃপ্রণালী বা জলাধারের গাত্রে প্লাস্টারের জন্য ব্যবহৃত হতো (Varma, 1983: 66-68)। হরপ্পা সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত কিছু প্রত্নস্থল থেকে এমন কিছু ভাস্কর্য পাওয়া গেছে যেগুলির গাত্রে সম্ভবত চুন, বালির আস্তরণ দেওয়া হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকেই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রে পাথর, স্টাকো, পলিমাটি প্রভৃতি উপাদানের ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় প্রচলিত হয় এবং তা গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী কালপর্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠে। প্রাচীন যুগের স্থপতি ও ভাস্করদের উপাদানগত জ্ঞান যথেষ্ট ছিল বলে মনে হয়। বিভিন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝা গেছে যে, নির্মাতারা প্রতিটি উপাদানের প্রকৌশল সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে অঞ্চল ভিত্তিতে উপাদানের সহজলভ্যতা একটি কারণ ছিল। শিল্পীরা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের শিল্পের বিকাশ ঘটাতেন সেই নির্দিষ্ট এলাকার সহজলভ্য উপাদানের কথা মাথায় রেখে। তবে এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, উপাদানগুলি ব্যবহারের সময় শিল্পীরা কি শিল্পশাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলি মেনে চলতেন? এর উত্তরে বলা যায় যে প্রথমে 'শিল্প', তারপরে 'শিল্পশাস্ত্র'। অধিকাংশ শিল্প-ঐতিহাসিক মনে করেন যে ধ্রুপদী শৈলির বৈশিষ্ট্যগুলিকে ধরে রাখার জন্য পরবর্তীকালে শিল্পশাস্ত্রগুলি রচিত হয়েছিল। তার মানেই বেশিরভাগ শিল্পশাস্ত্রগুলি গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তীকালে রচিত হয়েছিল। গুপ্ত পরবর্তী কালপর্ব থেকে উপমহাদেশীয় শিল্পকলায় অবনমন দেখা দিতে শুরু করে, কারণ এই সময় মধ্যযুগীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি উপমহাদেশীয় শিল্পের ভিতর আস্তে আস্তে অঙ্গীভূত হতে শুরু করে। তাই শাস্ত্রকাররা অনুভব করেছিলেন ধ্রুপদী

আদর্শকে জীবিত রাখার জন্য শিল্পের নির্মাণ ক্ষেত্রে কিছু নীতি নির্ধারণের প্রয়োজন, সেই জন্যেই শিল্পশাস্ত্রগুলি রচিত হয় (Bose, 1916 : 4-7)। শিল্পশাস্ত্রগুলিতে প্রতিমা-লক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা গেলেও, স্টাকো উপাদানটির উল্লেখ খুবই দুর্লভ।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রাচীন বাংলায় শিল্পের সূচনা খ্রিষ্টপূর্ব শতকে হয়েছিল। টেরাকোটা, ধাতু, পাথরের পাশাপাশি গুপ্ত পূর্ববর্তী সময় থেকেই এই অঞ্চলে স্টাকো উপাদানে নির্মিত ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণের প্রথা প্রচলিত হয়, যা গুপ্ত পরবর্তী আদি মধ্যযুগে বিকশিত হয়। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কর্ণসুবর্ণ, বেঁড়াচাপা, মোগলমারী, বাঁকুড়ার প্রভৃতি অঞ্চলের পাশাপাশি বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুর, মায়নামতী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে স্টাকো শিল্প গড়ে উঠে। সুধীররঞ্জন দাস, গৌতম সেনগুপ্ত ও দুর্গা বাসুকে বাদ দিলে বাংলার স্টাকো শিল্পের উৎস অনুসন্ধান ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে তেমন কেউই উৎসাহী হয়নি। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কে. এম. ভর্মা স্টাকোর উৎসানুসন্ধানে প্রয়াসী হলেও তাঁর গবেষণায় বাংলার স্টাকো শিল্প তেমন প্রাধান্য পায়নি। আমার এই প্রবন্ধটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বল্প আলোচিত বাংলার স্টাকো শিল্পের উৎস অনুসন্ধান করা এবং অঞ্চলভেদে গড়ে ওঠা স্টাকো শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করা। বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত, স্বল্প উল্লেখিত স্টাকো নিদর্শনগুলিকে আমার এই প্রবন্ধটিতে কালাক্রমিকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

৩. গবেষণা পদ্ধতি

প্রাচীন কাল থেকেই স্টাকোর ব্যবহার প্রচলিত ছিল তার পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি বাংলার একাধিক জায়গা থেকে প্রচুর স্টাকো ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হলো এই যে, বাংলার স্টাকো উপাদানটিকে কি শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল? সেটিকে অনুসন্ধানের জন্য একদিকে যেমন এই প্রবন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যগুলিকে প্রাথমিক উৎসের (primary sources) পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি অপরদিকে একাধিক দ্বৈতীয়িক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ (secondary sources) মূল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। প্রয়োজন অনুসারে তথ্য সংগ্রহ এবং সেসকল তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধের মূল অংশ লেখা হয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিগত একশো বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনগুলি থেকে স্টাকো সম্পর্কিত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

শিল্পকলার ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য ক্ষেত্রসমীক্ষারও বিশেষ গুরুত্ব আছে। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোগলমারী, বাঁকুড়া জেলার সিদ্ধেশ্বর ও সোনতাপলের মন্দির শিখর গাত্রে অলংকৃত স্টাকো নকশাগুলি নিজ চোখে দেখেছি, এবং আদিমধ্যযুগে স্টাকো নকশা কেমন ছিল তা অনুধাবনে সচেষ্ট হয়েছি। বিগত বছর অক্টোবর মাসে আশুতোষ সংগ্রহশালা ও রাজ্য পুরাতত্ত্ব সংগ্রহশালায় যাবার ফলে এবং সেখানে সংরক্ষিত বেশ কিছু স্টাকো মস্তক ও মূর্তি স্বচক্ষে দেখার ফলে তাদের শিল্পবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত হয়েছি, যা প্রত্যক্ষভাবে এই প্রবন্ধ রচনায় সহায়ক। মূলত সংগৃহীত তথ্যের বিবরণ ও বিশ্লেষণকে এই প্রবন্ধে গবেষণার পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. স্টাকো কী?

স্টাকো হল চুন, সুড়কি, বালি, জল, আঠা সমন্বিত একটি সংমিশ্রিত উপাদান, কিছুক্ষেত্রে এই উপাদানটি/যৌগটি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জ অথবা প্রাণীজ তন্তুর ব্যবহার করা হতো। স্টাকোর সংমিশ্রণটি প্রস্তুত করতে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হতো সেগুলি তৎকালীন পূর্ব ভারতে খুবই সহজলভ্য ছিল। স্টাকো প্রস্তুত করার জন্যে প্রধানত চুনের বেশী প্রয়োজন হতো। তবে এ ক্ষেত্রে আবার কিছু পার্থক্যও ছিল। মূলত আলোচ্য অঞ্চলে স্টাকো যৌগটি প্রস্তুতের সময় খণিজ চুনের বদলে কলিচুনের ব্যবহার করা হতো।[২] বর্তমান বিহার অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত চুনাপাথর থেকে নির্গত চুনই স্টাকো প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হতো। এই অঞ্চলে কোনোদিনই চুনাপাথরের অভাব ছিল না। বিহারের কাইমুর, মুঙ্গের, রোহটাস থেকে চুনাপাথর পাওয়া যেতো। তাছাড়া বাংলা তথা পূর্বভারতে স্টাকোর তৈরির অপর একটি উপাদান বালি, সহজেই পাওয়া যেত।[৩]

৪.১ স্টাকো শিল্পের শ্রেণিবিভাগ

বাংলায় স্টাকো শিল্পকে দুইভাগে ভাগ করা যায় যথা-১) মূর্ত (iconic) স্টাকো শিল্প, যার মধ্যে অন্তর্গত রয়েছে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত স্টাকো মূর্তিসমূহ। ২) বিমূর্ত (non-iconic) স্টাকো শিল্প, যেগুলির মধ্যে প্রধানত রয়েছে বিভিন্ন মন্দির ও বিহার গাত্রের বিভিন্ন অলংকরণ।

৫. প্রাচীন সাহিত্যগত উপাদানে বাংলার বর্ণনা

বহু প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানে বাংলার কথা উল্লেখ আছে।'বাংলা' বা 'বঙ্গ' শব্দটির উৎপত্তির ইতিহাস বিতর্কিত। *মহাভারত*, কালিদাসের *রঘুবংশ*-তে 'বঙ্গ' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী যে ভূখণ্ডকে বাংলা হিসাবে চিহ্নিত করা হতো, পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালপর্বে বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল। যথা- গৌড়, পৌন্ড্র, বঙ্গ, কোটীবর্ষ, সমতট, হরিকেল ইত্যাদি। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* অনুসারে আর্যাবর্তের পূর্বদিকে বসবাসরত অধিবাসীদের দস্যু হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। *রামায়ণ* অনুসারে (II, 10, p.p. 36-37) এই অঞ্চলের অধিবাসীদের সাথে সমৃদ্ধশালী অযোধ্যা নগরীর সম্পর্ক ছিল। অন্যদিকে *মহাভারতে* (II, 30 & IV 40, p.p. 23-25) দেখা যায় ভীম তার যুদ্ধযাত্রার সময় মোদকগিরি অর্থাৎ বর্তমান মুঙ্গেরের রাজাকে হত্যা করে বাংলায় প্রবেশ করেন। কোশী নদীর তীরবর্তী শক্তিশালী পুণ্ড্রনগরে না গিয়ে তিনি বঙ্গদেশ অভিযান ও ধ্বংস করেন। তারপর তিনি তাম্রলিপ্ত বা সূহ্মভূমির দিকে যাত্রা করেন। আবার *মহাভারতের* বনপর্বে করতোয়া নদীর তীরস্থ পুণ্ড্রনগর একটি উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উৎখননের ফলে বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে মৌর্যকালীন একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই শিলালিপিতে পুণ্ড্রনগর নগরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শস্য মজুত ও তা প্রয়োজনানুসারে বিতরণের কথা বলা আছে। সুতরাং এই শিলালিপি থেকে এটুকু স্পষ্ট হয় যে মৌর্যযুগে পুণ্ড্রবর্ধন একটি সমৃদ্ধশালী শহর ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতকে মধ্যবর্তী কালে রচিত *আচারঅঙ্গসূত্রে* (১, ৮.৩) লাধা অঞ্চলকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা- ১) বজ্রভূমি, ২) সূহ্মভূমি। বজ্রভূমিকে দুস্যদের অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে সূহ্মভূমির উল্লেখ *মহাভারত*, বৌদ্ধ সাহিত্যগত উপাদান *সংযুক্ত নিকায়ে* (Malalasekar, 2007, p.p. 1252) একটি সমৃদ্ধশালী অঞ্চল হিসেবে করা হয়েছে। চতুর্থ শতকে ভারতে আগত চৈনিক পরিবাজ্রক ফা-সিয়াং এর লেখাতে ও সপ্তম শতকে ভারতে আগত অপর এক চৈনিক পরিবাজ্রক সুয়াং জাং লেখাতে *পুন না ফা টান না* (পুণ্ড্রবর্ধন), *সান মো টা টো* (সমতট), *কিই লো না সু ফা লা ন* (কর্ণসুবর্ণ) প্রভৃতি বাংলার বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরের নাম পাওয়া যায় (Beal, 1970, p.p. 201-204)। এছাড়া গুপ্ত, চন্দ্র, সেন, রাত, খড়্গ প্রভৃতি বংশের লেখমালায় প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন এলাকার নাম পাওয়া যায়। খ্রিষ্টপূর্ব শতাব্দীগুলিতে সাহিত্যগত উপাদানে বঙ্গদেশের গুরুত্ব না থাকলেও, গুপ্ত পরবর্তীযুগে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বাংলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। ফলত এই অঞ্চলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলার স্বাভাবিকভাবেই বিকাশ ঘটে। খ্রিষ্টীয় অষ্টম নবম শতকে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ-এর নেসারি লেখাতে 'বঙ্গাল' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় (Amitabha, 1977, p. 2) । দশম ও একাদশ শতকে চোল রাজাদের লেখতে বঙ্গালদেশের উল্লেখ পাওয়া গেলেও,

চর্তুদশ শতকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 'শাহ ই বাঙ্গালাহ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। আকবরের সময় সুবা 'বাঙ্গালাহ' বলতে চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বোঝাত (Amitabha, 1977, p. 2) । ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে এই অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে বাংলা প্রদেশের গড়ে উঠেছিল (Amitabha, 1977, p. 6) ।

৬. বাংলার স্টাকো শিল্প

৬.১ পশ্চিমবঙ্গ

বাংলা নদীমাতৃক হবার কারণে এখানে চিরকালই পাথরের শিল্প অপেক্ষায় মৃৎশিল্পের প্রসার বেশী ঘটেছে। বাংলায় মৃৎশিল্পের পাশাপাশি পোড়ামাটি বা টেরাকোটা ও স্টাকো শিল্পের প্রসার ঘটে। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী সময়পর্বে পূর্বভারতে যে স্টাকো শিল্পের বিকাশ ঘটে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে বেশ কিছু অঞ্চল তার অংশ ছিল। তবে বিহারের স্টাকো শিল্পের সাথে বাংলার স্টাকো শিল্পের কিছু উপাদানগত পার্থক্য ছিল কারণ বঙ্গদেশে চুনাপাথরের অভাব থাকার জন্য এখানকার স্টাকো শিল্পীরা শামুক বা ঝিনুকের খোলা পুড়িয়ে চুন উৎপন্ন করত। সেই চুন দিয়ে স্টাকো সংমিশ্রণটিকে তৈরি করত।

প্রবন্ধটির প্রথমে এককভাবে নির্মিত স্টাকো মূর্তিগুলি (independent Stucco sculptures) ও উচ্চাবচ ভাস্কর্যগুলির (relief sculptures) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের শেষ অংশে কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া মন্দির অলংকরণে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্টাকো উপাদানে নির্মিত বিভিন্ন প্রকারের নকশাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১.১. *কর্ণসুবর্ণ*

সুয়াং জাং-এর ভ্রমণ বিবরণী থেকে জানা যায় যে, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে *Kle–lo–Na–Su–Fa–La–Na* বা কর্ণসুবর্ণ অঞ্চল ছিল ঘন জনবসতিপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এই অঞ্চলে ১০টি সংঘারাম ও ৫০টি দেবমন্দির ছিল। সংঘারামগুলির সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া আছে। এই সংঘারামগুলির পাশে সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত একটি স্তূপের কথা তার গ্রন্থে উল্লেখিত আছে (Beal, 1970: 201-204) ।

১৯৬২ সালে সুধীর রঞ্জন দাসের তত্ত্বাবধানে রাজবাড়ীডাঙা অঞ্চলে উৎখননের ফলে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয় (Ghosh, 1965, p, 46)। এই উৎখননের ফলে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক, সিল (Seal) আবিষ্কার করা সম্ভব

হয়েছিল। বিখ্যাত লিপি বিশারদ দীনেশচন্দ্র সরকার পোড়ামাটির সিলে খোদিত লিপিটিকে পাঠোদ্ধার করে এই স্থাপত্যগত কাঠামোকে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।

কর্ণসুবর্ণের আশেপাশের এলাকা যথা রাজবাড়ীডাঙা, রাক্ষুসীডাঙা প্রভৃতি জায়গা থেকে একাধিক স্টাকো নির্মিত মস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৫৮ সালে চিরুটির কাছাকাছি চাঁদপাড়া গ্রাম থেকে মৃণাল গুপ্ত স্টাকো মূর্তির সন্ধান পান। মূর্তিটির ২.৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শৈল্পিক ধারা লক্ষ করলে দেখা যায় মূর্তিটি লোকায়ত শৈলীর বৈশিষ্ট্য অনুসরণকারী। সম্ভবত মূর্তিটি খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায় (Das, 1968 : 14-15)।

রাজা শশাঙ্ক বিদ্যাপীঠের চত্বরে ঐ বছরেই উৎখনন চালিয়ে বেশ কিছু পোড়ামাটির নিদর্শনের পাশাপাশি গুপ্তপরবর্তী কালপর্বে নির্মিত একটি স্টাকোর অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে (Das, 1968, p.p. 14-15)। ১৯৬১ সালে সুধীর রঞ্জন দাস পরিখার মধ্যের স্তর থেকে গুপ্তপরবর্তী কালপর্বে দুটি স্টাকো মস্তকের সন্ধান পেয়েছিলেন। এদের মুখমণ্ডল ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত। দুটি মূর্তির অধরদ্বয় মাংসালো এবং পুরু, নাসিকা তেমন উন্নত নয় (Das, 1968, p.p. 25-27)। এই বৈশিষ্ট্যগুলি গুপ্তযুগের ধ্রুপদি আদর্শ থেকে বিচ্যুতির চিহ্ন বহনকারী। এই মস্তক দুটি সম্ভবত খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

তাছাড়া এই মহাবিহার থেকে স্টাকো প্লাস্টার করা দেওয়াল ও মেঝে আবিষ্কৃত হয়েছে ডি (D) ও ই (E) সিরিজের প্রত্নস্তর থেকে। এছাড়া এই অঞ্চলের আধিকাংশ কূপের বর্হিগাত্রে স্টাকো ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে এইগুলো আদিমধ্যযুগে নির্মিত হয়েছিল কি না তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সম্ভবত কূপের জলকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য বর্হিগাত্রে স্টাকোর প্লাস্টারের ব্যবহার করা হতো। বাংলার স্টাকো শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন কর্ণসুবর্ণ থেকে পাওয়া গেছে।

৬.১.২. চন্দ্রকেতুগড়

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার চন্দ্রকেতুগড়ে ১৯৬০ দশকে উৎখনন চালিয়ে বেশ কিছু স্টাকো নিদর্শন পাওয়া গেছে (Binoy, 1967, p. 64)। বর্তমানে বেঁড়াচাপা গ্রামে অবস্থিত এই প্রত্নস্থল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব শতকে নির্মিত বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক, স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ, একাধিক সিল (Seal) পাওয়া গেছে। উৎখননের ফলে যে স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তার গাত্রের প্রকোষ্ঠগুলি অলংকরণ ও প্লাস্টারের জন্য স্টাকো ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎখনন চালিয়ে স্টাকো প্লাস্টার করা দেওয়ালে কিছু অলংকৃত স্টাকো প্যানেল আবিষ্কৃত হয়েছে (Ghosh, 1969, p. 53)। ১৯৬৬-৬৭ সালে খনা মিহির ঢিবি অঞ্চলে উৎখনন চালিয়ে গুপ্তযুগীয় স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ, কিছু পাথর ও টেরাকোটা ভাস্কর্য, স্টাকো নির্মিত ফুল ও লতার নকশা আবিষ্কৃত হয়েছে। চন্দ্রকেতুগড়ের স্টাকোর নকশাগুলির সাথে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির গাত্রে স্টাকো নকশাগুলির মিল পাওয়া যায়। তবে চন্দ্রকেতুগড়ের নকশাটি প্রাচীনতম।

৬.১.৩. *মহানাদ*

গুপ্তপরবর্তী যুগে স্টাকো শিল্পের ধারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পরে। এই সময় বেশির ভাগ স্টাকো ভাস্কর্যগুলি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, ভাস্কর্য নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সময়কার শিল্পীরা ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্যগুলি অপেক্ষা স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আত্তীকরণ বেশি পরিমাণে করেছে। হুগলী জেলার মহানাদে ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে উন্নত নাসিকাযুক্ত স্টাকো মস্তক আবিষ্কৃত হয় (Fabri, 1936, p.43)। এই মস্তকটি বিস্ফারিত চক্ষুদ্বয়ের মাধ্যমে শিল্পী যেন সমগ্র মুখমণ্ডলে ক্রুদ্ধভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। যদিও মুখমন্ডলের নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পী কোনো পেলবীয় রেখার ব্যবহার করেনি, বরং পুরু অধরদ্বয়বিশিষ্ট এই মূর্তিটি সম্ভবত শিবের উগ্ররূপ রুদ্রের বলেই মনে হয়, কারণ সুপ্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি 'নাথ সম্প্রদায়' এর সাথে সম্পর্কিত ছিল। তাছাড়া হুগলী জেলার জনপ্রিয় শৈবতীর্থ হিসাবে মহানাদ পরিচিত। প্রভাস দাস এই অঞ্চলে উৎখনন চালিয়ে গুপ্তযুগে বরাহ মূর্তি আবিষ্কার করেন। এখানকার জটেশ্বর মন্দিরের সামনের আটচালায় অবস্থিত বিরল একপদ ভৈরবের মূর্তিটি শৈবতীর্থ হিসেবে মহানাদের গুরুত্বকে চিহ্নিত করে। এই মন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত অষ্টাদশ শতকীয় রাধাবল্লভ মন্দিরে বাইরের দেয়াল অলংকরণের জন্য স্টাকোর কিছু রিলিফ প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছিল, যা বর্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত ও ভগ্নপ্রায়। এই মন্দিরের অলংকরণের জন্য শিব দুর্গার বিবাহ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। শিব দুর্গার বিবাহদৃশ্য সমকালীন পাড়ামাটির শিল্পে খুবই জনপ্রিয় ছিল। ফলত, স্টাকো শিল্পীরা পোড়ামাটির শিল্পের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে হয়ত এই দৃশ্যের উপাস্থাপনা করেছিল। তাছাড়া একথা অনুমান করতে

অসুবিধা হয় না যে, গুপ্ত পরবর্তী কালপর্বে মহানাদে যে, স্টাকো শিল্পের প্রসার ঘটে, তা পরবর্তী যুগেও প্রচলিত ছিল। তবে একথা ঠিক যে, মহানাদে স্টাকো শিল্পের ইতিহাস আমাদের কাছে এখনো শতকরা আশি ভাগ অজানা।

৬.১.৪. বল্লাল ঢিবি

বিহার অঞ্চলের মতো বাংলাতে স্টাকো মূর্তি বা মস্তক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া না গেলেও গুপ্তপরবর্তী যুগে বাংলাতে বেশ কিছু অঞ্চলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্টাকো নির্মিত মস্তক ও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বল্লাল ঢিবি'। ১৯৮২–১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলে উৎখনন চালিয়ে উপরিস্তর থেকে বেশ কিছু স্টাকো নির্মিত মস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে (Nagaraja, 1985, p. 105)। বল্লাল ঢিবি থেকে প্রাপ্ত এই মস্তকগুলির সমগ্র মুখমণ্ডলে কাঠিন্য, পেলবতাহীনতা ফুটে উঠেছে, যা মধ্যযুগীয় শিল্পরীতির আগমনের বার্তাকে সূচিত করে। মহানাদ থেকে প্রাপ্ত স্টাকো নির্মিত মস্তকের সাথে বল্লাল ঢিবির মস্তকটির মিল থাকার জন্য এগুলি একই সময়পর্বের বলে মনে হয়। সম্ভবত এগুলি নবম-দশম শতকের মধ্যবর্তী কালপর্বে নির্মিত হয়েছিল।

১৯৮৫-৮৬ সালে পুনরায় এই অঞ্চলে উৎখনন চালিয়ে স্টাকো নির্মিত মস্তক ও কিছু স্টাকো উপাদানে নির্মিত পশুপাখি পাওয়া গেছে (Joshi, 1990, p. 108)। চন্দ্রকেতুগড় বাদ দিয়ে স্টাকো উপাদানে নির্মিত পশুপাখির নিদর্শন পূর্বভারতে অন্য কোনো জায়গা থেকে পাওয়া যায়নি। সমসাময়িক টেরাকোটা শিল্পে পশুপাখির অলংকরণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও স্টাকো শিল্পে পশুপাখির ব্যবহার কেনো লক্ষ করা যায় না সেই প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়। এই পর্যায়ে প্রাপ্ত মস্তকগুলি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত, কপালে ঊর্ণা, মাথায় অলংকৃত আভরণীবিশিষ্ট মস্তকটি সম্ভবত বুদ্ধের।

৬.১.৫. মোগলমারী

পশ্চিমবঙ্গের থেকে প্রাপ্ত স্টাকো শিল্প নিদর্শনগুলির মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন মহকুমার অন্তর্গত মোগলমারী বৌদ্ধবিহার গাত্রের স্টাকো অলংকরণ অন্যতম। সম্ভবত এই অঞ্চলে খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতকে বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করে দুটি আলাদা শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে, যা সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম ও শিক্ষাচর্চার ইতিহাসে মোগলমারী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। বৌদ্ধবিহারের বর্হিগাত্রে কিছু নকশা,

স্টাকো প্লাস্টার করা দেয়াল এবং স্টাকো প্যানেল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই স্টাকো প্যানেলে বর্গাকৃতি প্রকোষ্ঠগুলিতে বৌদ্ধদেবদেবী, গণ প্রভৃতি স্টাকো মূর্তির উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়।

২০০৩-০৪ সালের অধ্যাপক অশোক দত্তের তত্ত্বাবধানে এই অঞ্চলে উৎখনন চালিয়ে কে৬ (K_6) ও কে ৭ (K_7) নামক খাত থেকে স্টাকো প্লাস্টার করা দেওয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে কে ৬ (K_6) চিহ্নিত খাতের (trench) দেওয়ালের উচ্চতা ১০৪ সে. মি। আবার কে ৭ (K_7) চিহ্নিত খাতের দেয়ালের উচ্চতা ৩৭৫ সে. মি (Asok, 2008, p. 26)। এই দেওয়ালে কিছু ফুল পাতার নকশা দেখা যায়। বিশেষত পদ্ম পাপড়ির মতো লতার মাঝে অবস্থিত ছয়টি পাপড়িযুক্ত ফুলটি বেশ অকর্ষণীয়। পদ্ম পাপড়ির নকশাটি বিহারের মেঝের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্টাকো পদ্ম পাপড়ির নকশা নালন্দা মহাবিহারে ৩ নং স্তূপের গাত্রে অবস্থিত কুলঙ্গীর চারদিকে অলংকরণে ব্যবহৃত হতো।

২০০৭–০৮, ২০১০–১২ সালে পুনরায় মোগলমারী অঞ্চলে উৎখননের ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে থেকে স্টাকো প্লাস্টার করা দেয়াল পাওয়া গেছে। এক্স এ৯ (XA_9) চিহ্নিত খাত (trench) থেকে উত্তরমুখী ও এক্স ৭ (X_7) চিহ্নিত খাতের নিম্নস্তর থেকে স্টাকো প্লাস্টার করা দেয়াল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পরিখার উপরে স্তরে স্টাকোর মানুষ ও পশুর মস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে (Asok, 2008, p. 28)। কে ৮ (K_8) চিহ্নিত খাত থেকে একটি আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত মস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটি দেওয়ালের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। মূর্তিটির ভ্রুযুগল উত্থিত, চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত, কপালে ঊর্ণযুক্ত–এটি সম্ভবত বুদ্ধের মস্তক। এই মস্তকের সাথে গন্ধার অঞ্চলে প্রাপ্ত বেশ কিছু মূর্তির মুখমণ্ডলে মিল আছে।

পূর্বভারতের বৌদ্ধবিহারগুলির বহির্গাত্র অলংকরণে টেরাকোটা বা স্টাকোর রিলিফ প্যানেলের উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। নালন্দা মহাবিহারের ন্যায় মোগলমারী বৌদ্ধবিহারের বর্হিগাত্র অলংকরণের জন্য বর্গাকার কুলুঙ্গিতে বেশ কিছু স্টাকো মূর্তি লক্ষ করা যায়। এদের মধ্যে উৎকৃষ্টতম নিদর্শন হলো ঢিবির কেন্দ্রের পশ্চিমমুখী দেওয়ালে গ্রন্থিত গণ, গান্ধর্ব, বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলি। তবে একটি জাঙ্গুলী তারা ও একটি জম্ভল এর স্টাকো মূর্তিও দেখা যায়। বেশিরভাগ স্টাকো মূর্তি ভগ্নপ্রায় এবং খ্রিষ্টীয় নবম-দশম শতকীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্য বহনকারী। মহারাজলীলাসনে আসীন, বিবিধ অলংকারে সজ্জিত একটি বোধিসত্ত্বের মূর্তির অলংকার ও কেশবিন্যাসের ধরনে নালন্দার শৈলীর বৈশিষ্ট্য বহন করেছে (চিত্র. ১), ঠিক অন্যদিকে মুখমণ্ডল গঠনে, অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে শিল্পী তার নিজস্বতাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন।

জম্ভল–এর স্টাকো মূর্তিটি নির্মাণের ক্ষেত্রে শিল্পী নিজস্বতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মের জম্ভল ধনদেবতা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। এই মূর্তিটির কর্ণে কুণ্ডল, গলায় কণ্ঠহার। তিনি দক্ষিণ হস্তে মোদক জাতীয় বস্তু এবং বাম হাতে বেজি বা নেউলকে ধরে আছেন। মহারাজলীলাসনে আসীন এই মূর্তিটির উদরটি স্ফীত, যা বঙ্গদেশের অধিবাসীদের অন্যতম দৈহিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয় (Gautam, 2023, p.124), (চিত্র. ২)।

চিত্র. ২ জম্ভল-এর স্টাকো মূর্তি, মোগলমারী, খ্রিষ্টীয় নবম শতক

মোগলমারীর স্টাকো শিল্পীরা নালন্দা স্টাকো শিল্পশৈলীর দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল। পদ্মপাপড়ি নকশা, কিংবা মূর্তির অলংকার সজ্জা বা কেশরাশির বিন্যাস এইসব কিছুই ছিল নালন্দা শিল্পের অনুরূপ। এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, নালন্দা শিল্পীদের উত্তরসূরিরা কি মোগলমারী তথা বঙ্গদেশের অঞ্চলে স্টাকো শিল্পের বিকাশ সাধন করেছিল? ---- উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে এই প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, বঙ্গদেশের শিল্পীরা নালন্দা শিল্পধারা থেকে অনুপ্রাণিত হলেও, তারা যোগ্য উত্তরসূরি ছিল না। অধিকাংশ সময়ে বাংলার শিল্পীরা তাদের নিজস্বতা বজায় রেখেছেন এবং কিছুক্ষেত্রে ধ্রুপদি আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছেন। তবে বাংলাতে নালন্দা শিল্পের পূর্ববর্তী সময় থেকেই স্টাকো শিল্প প্রচলিত ছিল।

৬. ২. বাংলাদেশ

আদি-মধ্যযুগে মহাস্থান, সমতট, হরিকেল অঞ্চলের বৌদ্ধধর্মীয় স্থাপত্য গাত্রগুলি অলংকরণে পোড়ামাটির ব্যবহার অধিক মাত্রায় হলেও স্টাকো ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল না। পাহাড়পুর ও ইটাখোলা মুড়া থেকে স্টাকো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

৬. ২. ১. *পাহাড়পুর*

বর্তমান পাহাড়পুর অঞ্চল থেকে চারটি বুদ্ধের মস্তকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এইগুলো স্টাকো উপাদানে নির্মিত হয়েছিল। বুদ্ধমস্তকগুলো সবকটি এক রকমের। এদের প্রত্যেকের চোখ গোলাকার, কর্ণে লম্বা কর্ণকুণ্ডল এবং চারটি বুদ্ধ মস্তকের মধ্যে দুটির মাথায় জটামুকুট ও বাদবাকির মাথায় কুঞ্চিত কেশরাশি লক্ষ করা যায় (Dikshit, 1962, p. 109)। এই মস্তকগুলো সম্ভবত বৌদ্ধবিহারটি নির্মাণের প্রারম্ভিক পর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় সপ্তম-নবম শতকে নির্মিত হয়েছিল (চিত্র. ৩)।

চিত্র. ৩ বুদ্ধের স্টাকো মস্তক, পাহাড়পুর, খ্রিষ্টীয় সপ্তম-নবম শতক

(চিত্র ঋণ: A.S.I: A.R., 1927-28)

৬. ২. ২. *ময়নামতি*

কুমিল্লা জেলার ইটাখোলা বিহারের তৃতীয় নির্মাণ পর্যায়ের একটি বদ্ধ কক্ষ থেকে স্টাকোর মস্তকবিহীন বৈরচন বুদ্ধের মূর্তি পাওয়া গেছে (Iman, 2000: 64-67)। এই স্টাকো মূর্তি ভেঙে যাবার ফলে এটিকে মূল উপাসনাস্থল থেকে বদ্ধ কক্ষে স্থানান্তরিত করা হয়েছিলো কারণ ভাঙা মূর্তির পূজা বৌদ্ধশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল। মূর্তি বজ্রাসন আসীন এবং দুটি হাতেই বরদমুদ্রা প্রদর্শন করছে। সম্ভবত নালন্দা স্টাকো বুদ্ধ মূর্তির অনুকরণেই এই বৈরচন বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়েছিল (চিত্র. ৪)।

চিত্র. ৪ মস্তকবিহীন বৈরচন বুদ্ধের মূর্তি, ইটাখোলা বিহার, খ্রিষ্টীয় নবম-একাদশ শতক

৬. ৩. পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু মন্দির অলংকরণে স্টাকোর ব্যবহার

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী কালে নির্মিত অধিকাংশ মন্দিরের গাত্র অলংকরণের জন্যে স্টাকো ব্যবহার করা হয়েছে। বাঁকুড়ার সুপ্রাচীন রেখদেউলগুলির বর্হিগাত্র অলংকরণের জন্য স্টাকোর বিভিন্ন নকশা ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, রেখদেউলের অলংকরণে জন্য টেরাকোটা শিল্প ব্যতিরেকে কেনো স্টাকো অলংকরণ ব্যবহার করা হয়? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়, তবে ধারণা করা যেতে পারে যে সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে মন্দিরগাত্র অলংকরণের জন্য টেরাকোটা ও স্টাকো শিল্প সমানভাবে জনপ্রিয় ছিল। শিল্পী অথবা নির্মাতারা তাদের পছন্দ অনুসারে যে কোনো একটি উপকরণ দিয়ে অলংকরণ করাতেন।

৬. ৩. ১. *সিদ্ধেশ্বর মন্দির*

বর্তমান বাঁকুড়া জেলার ওন্দা মহকুমার অন্তর্গত বহুলাড়া গ্রামে রেখশৈলীতে নির্মিত সিদ্ধেশ্বর মন্দিরটি বিশালতা ও ব্যাতিক্রমী পরিকল্পনার কারণে বাংলার মন্দির শৈলীতে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছে। মন্দির গর্ভগৃহে বর্তমানে একটি শিবলিঙ্গসহ তিনটি পাথরের মূর্তি দেখা গেলেও, খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে এই অঞ্চল বৌদ্ধ, জৈন

ধর্মীয় শ্রমণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলে মনে হয়। মন্দিরটির চৌহদ্দির মধ্যে নিচু জমিতে ষোলোটি বৃত্তকার স্তূপ রয়েছে, যেগুলি সম্ভবত বৌদ্ধ অথবা জৈন সন্ন্যাসীদের শারীরিক অবশেষ (Ghosh, 1976: 363)। এইগুলিকে হয়তো পূজা অর্চনা করা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মন্দিরের মূল গর্ভগৃহে পার্শ্বনাথের প্রস্তরমূর্তি দেখা যায়, শৈলীগত বিচারে এটি নবম দশম শতকীয় বলে মনে হয়। সুতরাং এর থেকে ধারণা করা যায় যে, এইসময় এই অঞ্চলে জৈন ধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের শিখর ও বর্হিগাত্র অলংকরণের জন্য স্টাকোর বিভিন্ন নকশা ব্যবহার করা হয়েছে (চিত্র. ৫)। মন্দিরের শিখর ও গাত্রের বন্ধনী অংশের অলংকরণের জন্য স্টাকোর লতাপাতার নকশা দেখা যায়। মন্দিরের শিখর অংশের কর্ণ আমলক অলংকরণে স্টাকোর নকশা ব্যবহার করা হয়েছিল। মন্দিরের শিখরের কেন্দ্রস্থলে কুলুঙ্গি সদৃশ নকশা লক্ষ করা যায়। এছাড়া সমগ্র শিখর অংশ জুড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্টাকোর নকশা শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে। নবম থেকে একাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়কালে নির্মিত এই মন্দিরের শিখরের গাত্রের স্টাকো অলংকরণ সমগ্র মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। আনন্দ কুমারস্বামী, স্টেলা ক্রমারিশ, নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতো শিল্প ঐতিহাসিকরা সেজন্যই ইষ্টক দ্বারা নির্মিত রেখদেউলগুলির মধ্যে এই মন্দিরটিকে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

চিত্র. ৫ জ্যামিতিক নকশা, বহুলাড়া, খ্রিষ্টীয় নবম থেকে দশম শতক

৬. ৩. ২. *সোনতাপল মন্দির*

দ্বারকেশ্বর নদীর পাশেই অবস্থিত সোনতাপলের সূর্য মন্দিরটি সম্ভবত খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এই রেখদেউলটির গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ থাকলেও, পূর্বে এই মন্দিরটি সম্ভবত জৈন মন্দির ছিল। বহুলাড়ার মন্দিরটির ন্যায় এই মন্দিরের শিখর গাত্র স্টাকোর নকশা সংবলিত হলেও, বহুলাড়া মন্দিরের শিখর গাত্রের মতো এই মন্দিরের শিখর অংশে অধিক অলংকরণ এখানে দেখা যায় না। এই মন্দিরের শিখর গাত্রে খাঁজকাটা বা অলংকৃত ইটের নকশাগুলির উপরে স্টাকোর কোডিং দেওয়া হয়েছিল। ১২০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই মন্দিরে পূর্বদিকের শিখর অংশে বজ্রাসনে আসীন ধ্যানরত জৈন তীর্থঙ্করের স্টাকো মূর্তি দেখা যায় (Mccutchion, Rp. 2017, p. 313)। মূর্তিটির তৈরির ক্ষেত্রে শিল্পী মধ্যযুগীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়, কারণ মূর্তিটির সমগ্র মুখমণ্ডল ও দেহের কোনো অংশেই শিল্পীর কমনীয় রেখার ব্যবহার দেখা যায় না। বাঁকুড়া জেলার রেখদেউলগুলির শিখর অংশে স্টাকো অলংকরণ সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে শুরু হয়, পরবর্তীকালে নির্মিত সোনতাপল ও ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে এই স্টাকো অলংকরণ অবিরত থাকে।

৬. ৩. ৩ *ষাঁড়েশ্বর মন্দির*

বিষ্ণুপুর মহুকুমার ডিহর গ্রামে অবস্থিত ষাঁড়েশ্বর মন্দির শিখরের গাত্রে অবস্থিত কুলুঙ্গির মধ্যে স্টাকো লতাপাতা অলংকরণ দেখা যায়। এই লতাপাতা অলংকরণটি পূর্বে আলোচিত সকল লতাপাতার মতোই। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের শিখরের নকশাগুলির সাথে এই মন্দিরের নকশাগুলির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এই মন্দির ১৩৪৬ সালে নির্মিত হয়েছিল। অধিকাংশ স্টাকো নকশা বর্তমানে ভগ্নপ্রায়।

৬. ৩. ৪ *দেউলঘাটার মন্দির সমগ্র*

বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার আড়ষা থানার অন্তর্গত দেউলঘাটা গ্রামে মন্দিরদ্বয়ের শিখরগাত্রে স্টাকো অলংকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। দেউলঘাটার মন্দিরের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ই. টি. ডাল্টনের "Note on a Tour in Manbhoom in 1864-65" শীর্ষক প্রবন্ধে (Dalton,1866, p.p. 187-189)। তিনি কাঁসাই নদী তীরবর্তী বোড়ার গ্রামের সন্নিকটে তিনটি ইঁটের তৈরি রেখদেউলের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি এই অঞ্চলে বহু ইট ও পাথরের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। ডাল্টন তাঁর এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে রেখদেউলগুলি শিখর ও বহির্গাত্র ছিল সুন্দর কারুকার্যময়। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, অলংকৃত ইঁটগুলোকে প্রথমে ছাঁচে ফেলে তৈরি করা হতো, তারপর সেইগুলোকে মন্দিরের

শিখরে স্থাপন করা হতো। এই মন্দিরের অলংকৃত ইটগুলোকে দীর্ঘদিনযাবৎ টিকিয়ে রাখার জন্য স্টাকোর প্রলেপ ব্যবহার করে হয়েছিল। এছাড়া এই মন্দিরদ্বয়ের শিখর অংশে বিভিন্ন জায়গা স্টাকোর জটিল জ্যামিতিক নকশার অবতারণা লক্ষ করা যায় (চিত্র. ৬), যেগুলি সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের নকশাগুলির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। এই মন্দিরগুলির শিখরে কিছু ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র স্টাকো মূর্তি লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে বজ্রাসনে আসীন ধ্যানমগ্ন মহাবীর মূর্তি এবং বেশ কিছু ভগ্ন যক্ষ-যক্ষিণী মূর্তি দেখা যায় যা থেকে অনুমান করা হয় এই মন্দিরগুলো সম্ভবত জৈন মন্দির ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নবম দশম শতকে সমগ্র পুরুলিয়া জেলা জুড়ে জৈনধর্ম বিকাশ লাভ করেছিল।

চিত্র. ৬ জ্যামিতিক নকশা, দেউলঘাটা, একাদশ- দ্বাদশ শতক

৭. উপসংহার

সর্বশেষে বলা যায় যে, বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক স্টাকো নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার ফলে একথা প্রমাণিত হয় যে গুপ্ত এবং গুপ্ত পরবর্তী কালপর্বে স্টাকো শিল্পের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি

পেয়েছিল যা পরবর্তী অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বজায় থাকে। মধ্যযুগ ও পরবর্তী মধ্যযুগে বাংলার বৃহৎ স্থাপত্যগাত্র অলংকরণের জন্য স্টাকোর ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠে। বাংলার স্টাকো শিল্প চরিত্রগতভাবে ধর্মীয় ছিল। ধর্মকে কেন্দ্র করেই এই শিল্প আবর্তিত হয়েছে। বৌদ্ধবিহার, স্তূপ ও হিন্দু মন্দিরের গাত্র অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হবার কারণে স্টাকো ফলকগুলিতে বুদ্ধের জীবনের সাথে জড়িত বিভিন্ন ঘটনা ও হিন্দু দেবদেবীর প্রাণবন্ত রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। সমসাময়িক পোড়ামাটির ফলকগুলি আকৃতিতে স্টাকো ফলকগুলির অপেক্ষা ক্ষুদ্র হতো, ফলত বুদ্ধের জীবনের সাথে জড়িত একাধিক ঘটনা কিংবা তুলনামূলকভাবে বৃহৎ আকৃতির বুদ্ধের মূর্তির রূপায়ণ স্টাকো শিল্পে সম্ভব হয়েছে। আবার বাংলার স্টাকো শিল্পে লোকায়ত প্রাত্যহিক জীবনের রূপায়ণ বিরল। সমকালীন পোড়ামাটির ফলকে যেমন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্য যথা- শিকার, খেলাধূলো, বাণিজ্য, উৎসব ইত্যাদি দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল, যা স্টাকো শিল্পে দেখাই যায় না। তাছাড়া স্টাকো শিল্পে পশুপাখির রূপায়ণ করা হয়নি, যা পোড়ামাটির ফলকগুলিতে প্রায়শই দেখা যেত। বাংলার স্টাকো মূর্তিগুলি সাধারণভাবে নিরাবলম্ব (freestanding) নয়। স্টাকো উপাদানটি পাথর কিংবা ধাতুর মত কঠিন নয় বলেই হয়ত স্টাকো ভাস্কর্যের নিরাবলম্ব (freastanding) রূপায়ণ সহজসাধ্য ছিল না । তাই হয়ত বাংলার শিল্পীরা নিরাবলম্ব রূপায়ণের উপর খুব কমই গুরুত্ব দিয়েছেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলার স্টাকোর দেবদেবী মূর্তি কল্পিত হয়েছেন পূর্ণ যৌবনের রূপে। বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, তারা, গণ, গন্ধর্ব, নাগ, নাগী শরীরের সুঠাম ও বলিষ্ঠ গঠন পূর্ণ যৌবনের পরিচয় বহন করে চলেছে। তবে স্টাকো শিল্প নির্মাণে বাংলার শিল্পীরা ভাস্কর্যের রূপকল্পনায় বৈচিত্র এনেছে। আবার কিছু এমন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে যেগুলোকে শিল্পশৈলিগত ভাবে উৎকৃষ্ট না হলেও, স্টাকো শিল্পের প্রবাহমান ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না। কিছুক্ষেত্রে স্টাকো শিল্পীরা শাস্ত্রীয় অনুশাসন ব্যাতিরেকে নিজস্ব চিন্তাকে গুরুত্ব দিলেও, আধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসরণ করেছেন। একদিকে পেলবতা, অন্যদিকে যান্ত্রিকতা, দক্ষতা ও অদক্ষতার অদ্ভূত সংমিশ্রণে বাংলার স্টাকো শিল্প, শিল্প ইতিহাসের পাতায় এক অনন্য অধ্যায়ের সংযোজন করেছে।

অন্ত্য-টীকা

[১] যেমন আনন্দ কুমারস্বামী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্টেলা ক্রমারিশ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ

[২] স্টাকো সংমিশ্রণটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল কলিচুন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, চুনাপাথর কিংবা শামুক বা ঝিনুকের খোলা পুড়িয়ে এই কলিচুন উৎপন্ন করা হতো। যেটির রাসায়নিক নাম হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট, যার রাসায়নিক সংকেত হল $CaCO_3$এটি প্রধানত তিনটি উপাদান

যথা কার্বন, অক্সিজেন এবং ক্যালসিয়াম দ্বারা গঠিত। এই কার্বনেটের তাপীয় বিয়োজনের ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পাওয়া যায়। ৮২৫ ডিগ্রি (১.৫১৭ ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বনেট দহনের ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$CaCO_3\,(S) \rightarrow CaO\,(s) + CO_2\,(g)$

এই ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে জল মেশানোর ফলে কলিচুন উৎপন্ন হয়।

$CaO + H_2O = Ca\,(OH)_2$

এই উৎপন্ন কলিচুন সাদা, গন্ধহীন, অনিয়তকার একটি অজৈব পদার্থ, এটি গরম জল অপেক্ষায় ঠাণ্ডা জলে বেশী দ্রবণীয়। স্টাকো সংমিশ্রণটি তৈরির ক্ষেত্রে এই কলিচুন সবথেকে প্রয়োজনীয় পদার্থ। কলিচুন সাদা হবার কারণে বর্তমানে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। বিশেষত ঘরবাড়ী চুনকামের ক্ষেত্রে কলিচুনের ব্যবহার হয়ে থাকে। সাধারণত বাইরের দেয়ালের প্লাস্টারকে রক্ষা রাখার জন্য চুনকামের ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে প্রাচীনকালের স্থাপত্যের বর্হিগাত্রকে রোদ, বৃষ্টি, আর্দ্রতা জনিত সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য স্টাকো প্লাস্টার ব্যবহার করা হতো।

◦ স্টাকো প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল বালি। তটবর্তী অঞ্চলে বালির অভাব ছিল না। তবে বালির ক্ষেত্রে তারতম্য ছিল। যখন স্টাকোকে প্লাস্টার হিসাবে ব্যবহার করা হতো তখন তাতে মোটা দানার বালি উপাদান হিসাবে দেওয়া হতো এবং সেখানে বালির পরিমাণটি চুনের পরিমাণ অপেক্ষায় বেশী থাকত।এর সর্বোতকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে স্টাকো উপাদানটির রাসায়নিক পরীক্ষার ফলে। ১৯১৪-১৫ সালে ডি.আর.ভান্ডারকার বেসনগর থেকে আবিষ্কৃত প্লাস্টারের রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এখানে কলিচুনের পরিমাণ ছিল শতকরা ২২ ভাগ সুতরাং এখানে বালির ভাগটি বেশী ছিল কারণ এটিকে প্লাস্টার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার যখন স্টাকোর মূর্তি বা ভাস্কর্য তৈরীর জন্যও ব্যবহার করা হতো, সেক্ষেত্রে শিল্পীদের সরু দানার বালিই বেশী পছন্দের ছিল। তবে সেখানে চুনের পরিমাণটি বালির তুলনায় বেশী থাকতো। এম.এ.হাবিব মহেঞ্জোদারোর এইচআর প্রত্নস্থানের চৌবাচ্ছার গাত্র থেকে স্টাকো প্লাস্টারটির রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, এখানে কলিচুনের পরিমান ছিল শতকরা ৬৯ ভাগ। স্টাকোকে শক্ত করার জন্য ইঁটের গুঁড়ো অর্থাৎ সুড়কির ব্যবহার করা হতো। প্রয়োজনে ইঁটের ছোট ভাঙা টুকরোকে স্টাকোর সাথে মেশানো হতো। বালি ও চুনের মিশ্রণটি তৈরির পর সেটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য নির্দিষ্ট বেশ কিছুদিন জলে ভিজিয়ে রাখা হতো। কিছুদিন পরে সেই সংমিশ্রণকে জল থেকে তুলে, সমস্ত জল শুকিয়ে সমগ্র মিশ্রণটিকে জাঁতার মাধ্যমে ভালো করে মসৃণ করে নেওয়া হতো। তারপর তার সাথে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ তন্তু মিশিয়ে সেটিকে ভাস্কর্য ও মূর্তিতে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হতো।

◦ এই প্রত্নস্থান থেকেই মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী যুগের ধারাবাহিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জী

Beal, Samuel [tr.] (1884). *Si-Yu-Ki*. Vol. I & II. London: Trübner and Co.

Amitabha, Bhattacharyya. (1977). *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal.* Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta.

Phanindra Nath, Bose. (1916). *Principles of Indian Śilpaśastra.* Lahore: The Panjab Sanskrit Book Depot.

Dalton, E. T. (1866). 'Notes on a Tour in Manbhoom in 1864-65'. *Journal of the Asiatic Society of Bengal*. Vol. XXXV. Part. 1. Asiatic Society of Bengal, Calcutta.

Das, S. R. (1968). *Rājbādīḍaṅgā*. The Asiatic Society, Kolkata.

Dikshit, K. N. (Rp. 1999). *Excavations at Paharpur Bengal*. The Director General Archaeological Survey of India, New Delhi.

Asok, Dutta [ed.] (2008). *Excavation at Moghalmari*. The Asiatic Society, Kolkata.

Fabri, C. L. [ed.] (1936). *Annual Report of The Archaeological Survey of India For The Years 1930-31, 1931-32, 1933-34 And 1933-34*. Manager of Publication, Delhi.

Ghose, A. [ed.] (1965). *Indian Archaeology, 1962-63 -A Review*. The Director General Archaeological Survey of India, New Delhi.

Ghose, A. [ed.] (1967). *Indian Archaeology, 1963-64 -A Review*. The Director General Archaeological Survey of India, New Delhi.

Ghose, A. [ed.] (1969). *Indian Archaeology, 1964-65 -A Review*. The Director General Archaeological Survey of India, New Delhi.

Binoy, Ghosh (1976). *Paschim Banger Sanskriti.* (in Bengali). Part. I. Prakash Bhaban, Kolkata.

Imam, Abu (2000). *Excavation at Mainamati: An Exploratory Study*. Enamul Hoque (ed.). The International Center for Study of Bengal Art, Dhaka.

Jagat Pati, Joshi (1990). *Indian Archaeology, 1985-86 -A Review*. The Director General Archaeological Survey of India, New Delhi.

McCutcheon, David. J. (Rp. 2017). *Late Mediaeval Temple of Bengal*. The Asiatic Society, Kolkata.

Malalasekar, G. P. (Rp. 2007). *Dictionary of Pali Proper Meaning*. Motilal Banarsidass Publishing House, New Delhi.

Nagaraja Rao, M. S. [ed.] (1985). *Indian Archaeology, 1982-83 -A Review*. The Director General Archaeological Survey of India, New Delhi.

Gautam, Sengupta. (2023). *Ganga-Brahmaputra and Beyond*. Primus Book, New Delhi.

Van Butenen, A. B. [ed.] (1980). *The Mahābhārata*. Vol. II. USA: University of Chicago Press.

Varma, K. M. (1983). *Stucco in India from Pre-Mohenjodaro time to the beginning of Christian Era*, Proddu: Santiniketan.